International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-IV, July 2026, Page No. 31-46
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.04W.343

বঙ্গ-ওড়িশা সীমান্তের কৃষ্ণযাত্রার ধারা: একটি আঙ্গিকগত পাঠ

পূর্বাশা মাইতি
গবেষক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 21.07.2026; Accepted: 26.07.2026; Available online: 31.07.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Krishnajatra is one of the oldest traditional theatrical forms of Bengal which had flourished once in both Kolkata and rural Bengal but now comes in verge of extinction. This traditional Bengali theatre which had originated from the older dramatic performance such as 'natgit' and 'lilanat', gradually converted into a complete theatrical performance from the end of 18th century by Shishuram Adhikari and his disciples and soon became a non-ritualistic popular mode of entertainment for mass audience, besides the earlier ritualistic, religious performance of 'Krishnalila'. In Orissa border region of South-West Bengal Krishnajatra was performed as 'Balak-jatra' by the troops of 8-12 years old boys throughout the year in any occasions such as village festivals, community gatherings, seasonal fair or even family functions, especially in wealthy households. Once widely celebrated, this folk performance is now almost disappeared because of modern day entertainment, but still preserved in memories and manuscripts. Although Krishnajatra has occupied a significant place in Bengal's cultural heritage, very little documentation work exists till today except the palas of few eminent 'Adhikaris' such as Gobinda Adhikari, Nilkantha Mukhopadhay, Krishnakamal Goswami etc. The palas written by the anonymous village artists and performed in various regional pockets all over the Bengal throughout centuries are yet to be documented and sadly are not even discussed much in our academic discourse. In this context the purpose of the study is to examine the tradition of Krishnajatra in Bengal-Orissa border region with special emphasis on its performative style and reconstruct its distinctive theatrical features on basis of a hand-written manuscript of the play 'Manbhanjan' collected by the author from a veteran performer and also the interviews taken from him and few other older folks who still hold the memory of it as fresh as present.

Keyword: Traditional performance, Folk Theatre, Intangible Cultulral heritage, Documentation, Reconstruction of theatrical features, Performance study, Analysis of performance structure and theatrical style

বাংলায় 'কানু ছাড়া গীত নাই' কেবল নয়, কানু ছাড়া নাট্যও নেই। বাংলা ঐতিহ্যবাহী নাট্যের ইতিহাস অনুসরণ করলে দেখা যায় প্রাক্ চৈতন্যযুগের গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রভৃতি নাটগীত, নারী সমাজের দলবদ্ধ আদিরসাত্মক নৃত্যগীতাভিনয় ধামালি থেকে শুরু করে চৈতন্য অভিনীত ও নির্দেশিত নাট্যানুষ্ঠান ও তৎপরবর্তী লীলানাট্যের ধারা– সর্বত্রই বিষয়াধার সেই কৃষ্ণলীলা। রামলীলার প্রসঙ্গ থাকলেও তাও এসেছে কৃষ্ণলীলারই সম্প্রসারিত অংশ হিসেবে। আর বাংলা যাত্রা তো জন্মলগ্ন থেকেই কৃষ্ণকথামূলক। লীলানাট্য রূপে অভিনীত 'কালিয়দমন' অবলম্বনে অষ্টাদশ শতকের অন্তে স্বতন্ত্র নাট্যরীতি রূপে যাত্রার আবির্ভাব।[১] এই কালিয়দমন যাত্রা

তথা কৃষ্ণযাত্রার পথ ধরে পরবর্তীতে যাত্রাগানের আসরে প্রবেশ করে চণ্ডীযাত্রা, মনসাযাত্রা, গঙ্গাযাত্রা, শিবযাত্রা প্রভৃতি। তবে যাত্রাগানে কৃষ্ণকাহিনীর প্রাধান্য উনিশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্তও অক্ষুণ্ণ ছিল। শুধুমাত্র বাংলাদেশে নয়, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সর্বত্রই লোকনাট্যের প্রধান উপজীব্য রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ। লৌকিক নাট্যরীতিতে কৃষ্ণপ্রসঙ্গের এই একাধিপত্যের কারণ কৃষ্ণ কাহিনীর মধ্যেই নাটকীয়তা বর্তমান। বিশেষত কৃষ্ণকথার কৌতুক ও চাতুরী পূর্ণ ঘটনাগুলি, শৃঙ্গাররসাত্মক রাধাকৃষ্ণের লীলা-প্রসঙ্গ লোকসমাজে অন্যান্য দেবলীলা অপেক্ষা রুচিকর ও আনন্দদায়ক রূপে পরিগৃহীত হয়েছিল। এতদ্‌ব্যতীত এর পশ্চাতে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীর ভারতব্যাপী প্রবাহিত ভক্তিভাবনার প্রভাব থাকাও অসম্ভব নয়। বাংলাদেশে এই ভক্তিবাদের সূচনা খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকে মাধবেন্দ্রপুরীর ভাগবত ধর্ম প্রচারের মধ্য দিয়ে। আর ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্যের ভক্তি আন্দোলন বাঙালি জীবনকে যে কৃষ্ণপ্রেম ও ভক্তির জোয়ারে প্লাবিত করেছিল তাতে বাঙালি মাত্রেই কি শাক্ত কি শৈব প্রকারান্তরে বৈষ্ণব। তাই নাট্যরসপিপাসু ভক্তিপ্রাণ বাঙালি কৃষ্ণকথার মধ্যেই তাদের চিত্তমুক্তি ও রসস্ফূর্তির সন্ধান পেয়েছিল।

'কৃষ্ণযাত্রা' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ 'কৃষ্ণ জন্মযাত্রা'। অর্থাৎ কৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণের লীলামাহাত্ম্য জ্ঞাপক নাট্য-গীত সহ শোভাযাত্রা। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে "কৃষ্ণলীলার ব্যাপার সাধারণের চিত্তে দৃঢ়াঙ্কিত রাখিবার জন্য সেই লীলাময়ের অপূর্ব চরিত্রের এক একটি অংশমাত্র প্রদর্শন"[২] করে উৎসব ও তদুপলক্ষ্যে নাট্যানুষ্ঠানের প্রবর্তন হয়েছিল। কালক্রমে নাট্যানুষ্ঠানের আকর্ষণ ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্থ সংকোচনের ফলে কৃষ্ণযাত্রার অর্থ দাঁড়ায় 'কৃষ্ণ বিষয়ক যাত্রা'। কেবলমাত্র ভাগবত আশ্রয়ী কৃষ্ণকথা নয়, কৃষ্ণ চরিত্রকে কেন্দ্র করে যেসব আখ্যান লোকমানসে বর্তমান সেই মৌখিক পরম্পরাকে আশ্রয় করে গ্রামের আসরে যে যাত্রা অনুষ্ঠিত হয় তাই কৃষ্ণযাত্রা। আদিতে শ্রীকৃষ্ণচরিত্র ও রাধা-কৃষ্ণ লীলা বিষয়ক আখ্যানই ছিল কৃষ্ণযাত্রার উপজীব্য। পরবর্তীতে শ্রীকৃষ্ণের অবতার হিসেবে চৈতন্যদেবের প্রতিষ্ঠা ঘটলে তাঁকে ঘিরে 'চৈতন্য যাত্রা' নামে কৃষ্ণযাত্রার এক নবনাট্যরীতি বিকশিত হয়। কারণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিকট চৈতন্য-বন্দনা কৃষ্ণবন্দনারই নামান্তর। চৈতন্যের লোকাতীত জীবনে তাঁরা ভগবৎ শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলার ছায়া অবলোকন করেছেন। চৈতন্যযাত্রায় ঐতিহাসিক চরিত্র চৈতন্যদেব ও তাঁর পার্ষদবর্গের বাস্তব জীবন-আখ্যানের পাশাপাশি তাঁদের কেন্দ্র করে বৈষ্ণবীয় ভক্তিবাদ ও কল্পনার মিশেলে সেযব অতিলৌকিক মহিমাব্যঞ্জক কিংবদন্তী ভক্তকূলের মধ্যে পল্লবিত হয়েছিল তা নাট্যাকারে উপস্থাপিত করা হয়। আসলে চৈতন্যের জীবনটিও এক মহানাটক। তাই তাঁর জীবন আখ্যান বিশেষত সন্ন্যাস গ্রহণের বৃত্তান্ত অধিকতর হৃদয়গ্রাহী আবেগ জাগ্রতকারী আখ্যান হিসেবে অচিরেই কৃষ্ণলীলার আসরে জায়গা করে নেয়।

কৃষ্ণযাত্রা আসলে কৃষ্ণলীলাই, যদিও সূক্ষ্ম প্রভেদ বর্তমান। ষোড়শ শতকে নবদ্বীপে চন্দ্রশেখর আচার্যের বাসভবনে চৈতন্যদেবের 'রুক্মিণীহরণ' পালার অভিনয় থেকে যে কৃষ্ণ বিষয়ক লীলানাট্যের সূচনা হয়েছিল তার সঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ হতে সম্প্রদায়গত সীমা অতিক্রম করে সর্বজনীন রসাস্বাদনের নিমিত্ত অনানুষ্ঠানিক ভাবে যে কৃষ্ণযাত্রা অভিনীত হতে শুরু করে তার আঙ্গিক ও পরিবেশন-রীতির প্রভেদ রয়েছে। চৈতন্যজীবনী গ্রন্থে চরিতকারগণ মহাপ্রভুর লীলাভিনয়ের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন তৎদৃষ্টে অনুমিত হয় যে অভিনয় ছিল অঙ্কের বন্ধনে পরিবেশিত গীতিনৃত্যনাট্য। নৃত্য ও সংগীতই তার প্রধান অঙ্গ, মাঝে কিছু Extempore জাতীয় খণ্ড সংলাপ। শিথিলবদ্ধ কাহিনী, সঙ্গীতের পর সঙ্গীত যোজনা করে পরিণামমুখী করা হয়েছে। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বৈষ্ণব ভক্ত-সমাজে অভিনীত কৃষ্ণলীলা ছিল এ হেন কীর্তনাঙ্গ ভক্তিরসাত্মক নৃত্য-গীতাভিনয়। প্রাচীন যাত্রাওয়ালারা সকলেই ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী, সুতরাং কৃষ্ণপ্রেমলীলা কীর্তন করা ছিল তাদের ধর্মীয় সাধনের অঙ্গ। তাই লীলানাট্য পরিবেশিত হত তিথি নক্ষত্র অনুসারে বিভিন্ন উৎস বা পূজা-অনুষ্ঠানে সামগ্রিক

কৃত্যের অংশ রূপে, নাটমন্দির বা আখড়ার নামঘরই এই নাট্যের অভিনয়-স্থল। বাংলার গ্রামগুলিতে বৈষ্ণব মঠ-মন্দিরে কৃষ্ণলীলা আজও অভিনীত হয়ে চলেছে কৃত্যনাট্য হিসেবে। ঐতিহ্যানুগ আঙ্গিক ও প্রয়োগ-পদ্ধতি অনুসরণের মধ্য দিয়ে তা এখনও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে দীপ্যমান। অপর দিকে কৃষ্ণযাত্রা অনানুষ্ঠানিক, কৃত্যের সঙ্গে সংযোগহীন সম্পূর্ণ বিনোদনমূলক নাট্যাভিনয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে ঐতিহ্যবাহী নাট্যের যে বিশেষ ধারাটি কৃষ্ণলীলার কৃত্যরীতি থেকে বিনির্গত হয়ে নিতান্ত গোষ্ঠীভিত্তিক নাট্যচর্চার গণ্ডী পেরিয়ে সর্বসাধারণের চিত্তরঞ্জক নাট্যকলায় পরিণত হয় তাই কৃষ্ণযাত্রা। কেন্দুলী নিবাসী শিশুরাম অধিকারীই প্রথম নামঘরের কৃত্য-নাট্যকে কৃত্য-নিরপেক্ষ অনানুষ্ঠানিক সর্বজনীন প্রমোদকলায় রূপান্তর করলেন। নিতান্ত গোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত ভক্তিবাদী নাট্যকলা থেকে 'কৃষ্ণলীলা' ধর্মীয় সম্প্রদায় নির্বিশেষে সর্বজনীন 'কৃষ্ণযাত্রা'য় পরিণত হল। ফলত এবার থেকে কৃষ্ণলীলার অভিনয় কেবল ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠানে নয় অনুৎসবেও দেখা দিল, আখড়ার 'নামঘর' বা নাটমন্দির ছেড়ে ভক্তের গৃহাঙ্গণ, গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপ কিংবা বারোয়ারীতলার আটচালায় মঞ্চস্থ হতে লাগল। উপলক্ষ্যের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গিক ও পরিবেশনরীতিরও বদল ঘটল। শিশুরাম বীরভূমের সন্তান। তাই কীর্তনের ভাব-সামগ্রী ও ঝুমুরের আদর্শকে অনুসরণ করে তিনি পূর্বতন বৈষ্ণবীয় লীলানাট্যের আঙ্গিককে পুনর্বিন্যস্ত করে সর্বসাধারণের বিনোদন উপযোগী রূপ দান করলেন। এইভাবে রাঢ়ের কৃষ্ণনাটগীত ও ঝুমুরের রসসিক্ত মাটি থেকেই যে 'নবসংস্কৃত কৃষ্ণযাত্রা' জন্ম নিল তাই পরবর্তীকালে শিষ্য-প্রশিষ্যপরম্পরায় শ্রীদাম-সুদাম, পরমানন্দ অধিকারী, বদন অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারী, কৃষ্ণকমল গোস্বামী, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ প্রথিতযশা প্রাচীন যাত্রাকারেদের দ্বারা উৎকর্ষমণ্ডিত হয়ে, জনরুচির দাবী মিটিয়ে যুগোপযোগী নাট্য-উপাদান আত্তীকরণের মধ্য দিয়ে নিত্য-নবায়িত আজও বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তরে ভক্তিরস সুধা দান করে চলেছে।

ওড়িশার সীমান্ত সংলগ্ন বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তিক অঞ্চলে রাধাকৃষ্ণের লীলাপ্রসঙ্গ নিয়ে নাট্যাভিনয়ের ধারা অতি প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত। মনে রাখতে হবে এই অঞ্চলেরই অদূরে বাঁকুড়া জেলার থেকে আবিষ্কৃত হয়েছিল মধ্যযুগের কৃষ্ণবিষয়ক নাটগীতের অন্যতম প্রামাণ্য পুথিটি। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর ভাষার সঙ্গে আলোচ্য অঞ্চলের কথ্যভাষার সাদৃশ্যও অলক্ষণীয় নয়। এতদ্ অঞ্চলে অভিনীত লৌকিক প্রণয় কাহিনী নির্ভর 'চড়িয়া-চড়িয়ানী' পালায় ত্রি-চরিত্র বিশিষ্ট, শৃঙ্গাররসাত্মক, উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক প্রাচীন নাটগীতের আঙ্গিকটি আজও বর্তমান রয়েছে। লৌকিক নাটগীতের এই ধারাই চৈতন্যদেব প্রবর্তিত প্রেমভক্তির স্পর্শে উত্তোরিত হয় কৃষ্ণযাত্রায়। শ্রীচৈতন্যদেবের চরণস্পর্শধন্য শ্যামানন্দী বৈষ্ণব ধর্মের জন্মস্থল ছাপান্ন মাদল ও মহোৎসবে মুখরিত এই পূত ভূমিতে কৃষ্ণযাত্রার শিকড় প্রোথিত হয়েছিল লোকায়ত জীবনের প্রত্যন্ত গভীরে। যুগ যুগ ধরে পদাবলী সাহিত্যের রসসুধা, বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব-দর্শনের গূঢ় কথন সহজে সর্বজনবোধ্যভাবে লোকসমাজের অন্তরে প্রবেশ করেছে এই সকল কৃষ্ণকথা আশ্রিত পালাগুলির মধ্য দিয়ে। সেই সঙ্গে বৈচিত্র্যহীন গ্রামীণ জীবনে বিনোদনের শূন্যস্থানটিও পূরণ হয়েছে। কৃষ্ণযাত্রা বা আঞ্চলিক উচ্চারণে 'কিষ্ট যাত্রা'। কলকাতা সহ সন্নিহিত জেলাগুলিতে মঞ্চ নাটক ও পেশাদার যাত্রার দাপটে কৃষ্ণযাত্রা বহুকাল পূর্বেই অন্তর্হিত হলেও অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলায় এই নাট্যধারাটি গত শতাব্দীর ষাটের দশক পর্যন্ত দাপটের সঙ্গে বহমান ছিল। মানভঞ্জন, যুগলমিলন, নৌকাবিলাস, কলঙ্কভঞ্জন, সুবল-মিলন, মাথুর, কংসবধ, নিমাই সন্ন্যাস— প্রভৃতি কৃষ্ণযাত্রার পালাগুলি একসময় প্রেমরস-ভক্তিরসের বারি-সিঞ্চনে, আধ্যাত্মিক চেতনার উদ্বোধনে, মনোহরশাহী কীর্তনের সুরে-বাদ্যে, সুরাত্মক সংলাপের অভিনয়ে এই সীমান্ত বাংলার হৃদয় আলোড়িত করেছিল। একবিংশ শতকের সূচনাতেও কিছু পেশাদার দলকে বিক্ষিপ্ত ভাবে কৃষ্ণযাত্রার অভিনয় করতে দেখা গেছে। কিন্তু গণমাধ্যমের প্রসারের সঙ্গে গ্রামীণ সংস্কৃতির চিত্রটিও বদলাতে শুরু করে। মনোরঞ্জনের অন্যবিধ উপকরণের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলা থেকে বর্তমানে কৃষ্ণযাত্রা প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে চলার পথে। আলোচ্য বঙ্গে এখন আর কোনো

কৃষ্ণযাত্রার দল নেই, তবে এখনও গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছেন কৃষ্ণযাত্রার শিল্পীরা, রয়েছে তাঁদের খাতাপত্র, ভেঙে যাওয়া দলগুলির বহু রজনীর স্মৃতিবাহী ধূলি-ধূসরিত বাক্স-প্যাঁটরা, সাজপোষাক। বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যের এই ক্ষয়িষ্ণু ধারাটি আজও বেঁচে রয়েছে এখানকার প্রবীণ দর্শক ও শিল্পীদের স্মৃতিপটে। ক্ষেত্রসমীক্ষায় বর্তমান প্রবন্ধের লেখক এরকমই একজন অশতিপর শিল্পী রবীন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন কৃষ্ণযাত্রার পালার একখানি হস্তলিখিত জীর্ণ পাণ্ডুলিপি। পালার নাম 'মানভঞ্জন', পালাকার শ্রী মন্মথকুমার সিংহ, তিনিই দলের অধিকারী। কোনো মুদ্রিত বই-পুস্তিকা থেকে পালা সংগ্রহ করে নিজস্ব কিছু সংযোজন বিয়োজনের মধ্য দিয়ে অধিকারীরা মূলত এই পালাগুলি বাঁধতেন। প্রবীণ শিল্পীর থেকে সংগৃহীত এই পাণ্ডুলিপি ও তাঁর দেওয়া স্বাক্ষাৎকারের ওপর নির্ভর করে আলোচ্য দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলায় এই ঐতিহ্যবাহী পরিবেশন-শিল্পটির আঙ্গিক ও পরিবেশন রীতি কিরূপ ছিল তা অনুসন্ধান করা হল—

সংগৃহীত পালা পরিচয় :–

পালার নাম- মানভঞ্জন

অধিকারী ও রচয়িতা- শ্রীমন্মথকুমার সিংহ

সংগ্রহের স্থান- ভেটিয়া দক্ষিণ, দাঁতন-১, পশ্চিম মেদিনীপুর

অভিনয়ের সময়- দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলায় কৃষ্ণকাহিনী বিষয়ক যে ঐতিহ্যবাহী নাট্য অভিনীত হত তা পূজা-পার্বণ উৎসব-অনুষ্ঠান নিরপেক্ষ। কোনো সুনির্দিষ্ট বার-তিথি মেনে অভিনীত হত না। যেকোন লোক উৎসব, মেলা, দেশপূজা উপলক্ষ্যে বা নিছকই কৃষিনির্ভর গ্রামীণ জীবনে কৃষিকাজের অবসরে বিনোদনের উদ্দেশ্যে সমবেত উদ্যোগে নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করা হত। অর্থাৎ অভিনয় উপলক্ষ্যের বিচারে একে আচারকেন্দ্রিক লীলানাট্য নয় বরং অনানুষ্ঠানিক বিনোদনমূলক কৃষ্ণযাত্রার ধারাভুক্ত করা যেতে পারে। সাধারণত অগ্রহায়ণে ফসল কাটার পর পৌষের শেষ থেকে বৈশাখের শুরু পর্যন্ত শীতের মাসগুলিতে গ্রামে-গঞ্জে কৃষ্ণযাত্রা সহ বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্যগুলির আসর বসত।

পৃষ্ঠপোষক- লোকায়ত সমাজই এই সকল যাত্রাগানের পৃষ্ঠপোষোক। সাধারণত বারোয়রির উদ্যোগে গ্রামের সকলের থেকে চাল-ডাল, বায়নার টাকা চাঁদা তুলে সংগ্রহ করে যাত্রাভিনয়ের আয়োজন করা হত। এছাড়া কৃষ্ণযাত্রা যেহেতু ভক্তিমার্গের যাত্রা তাই ধর্মপ্রাণ গৃহস্বামীগণ যাঁরা আর্থিক দিক থেকে সম্পন্ন তাঁরাও কখনও সখনও কৃষ্ণকথা শ্রবণের অভিলাষে পূজা বা গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানে কৃষ্ণযাত্রার অভিনয়ের বন্দোবস্ত করতেন। তবে কৃষ্ণযাত্রার ক্ষেত্রে সর্বজনীন উদ্যোগই ছিল বেশী।

আসর– অন্যান্য লোকনাট্যের ন্যায় কৃষ্ণযাত্রাও পরিবেশিত হত ঐতিহ্যগত বৃত্তাকার মঞ্চে, যার চর্তুদিক পরিবেষ্ঠন করে থাকেন দর্শকরা, মাঝের বর্গাকার ক্ষেত্রে চারটি খুঁটি পুঁতে মাথার ওপর শামিয়ানা টাঙিয়ে কিংবা খোলা আকাশের নীচে চলে যাত্রার অভিনয়। কোনো উঁচু মঞ্চ থাকে না, দর্শক ও অভিনেতারা একই তলে বিরাজ করেন। অভিনয়স্থলের এক পাশে উপবেশন করেন বাদ্যযন্ত্রীরা। তখনও পর্যন্ত গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ না পৌঁছানোয় যাত্রা অনুষ্ঠিত হত পেট্রোম্যাক্সের আলোয়।

বাদ্যযন্ত্র- যেকোনো বৈষ্ণবীয় গীত ও নাট্যে প্রধান বাদ্য হল খোল বা মৃদঙ্গ। কৃষ্ণযাত্রার পরিবেশনাতেও অপরিহার্য অঙ্গ হল খোল এবং করতাল। এছাড়া অন্যান্য যে বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ছিল— হারমোনিয়াম, ডুগি-তবলা, জুড়ি, সানাই, কর্ণেট, ফুলেট বাঁশি, বেহালা ইত্যাদি।

আহার্য- পোশাক ভাড়া করে আনা হত। কুশীলবরা চরিত্রানুযায়ী 'আহার্য' গ্রহণ করতেন তবে তাতে আধুনিক যাত্রার মতো আড়ম্বর থাকত না, সাদামাঠা পোশাকেই অভিনয় হত। যেমন, গৌরাঙ্গের বেশ-বিন্যাসে থাকত ধুতি, ফতুয়া ও উত্তরীয়। কৃষ্ণের ক্ষেত্রে রঙিন ধুতি, উত্তরীয়, শিরে উষ্ণীষ, তাতে ময়ূরপুচ্ছ। কম বয়েসী

ছেলেরাই নারী চরিত্রে অবতীর্ণ হত। তাদের পরিধেয় ছিল শাড়ী, মাথায় চেলী, পরচুলা, উপযুক্ত গহনা। রূপসজ্জা হিসেবে কৃষ্ণের সর্বাঙ্গে নীল রঙ, ললাটে চন্দনের তীলক এবং রাধা সহ সখীদের মুখমণ্ডলে পুরু পাউডারের প্রলেপ, কপালে গাঢ় লাল কুমকুমের টিপ এবং রাধার ললাটে চন্দনের কল্কার ব্যবহার ছিল।

কুশীলব–

- চরিত্রাভিনেতা- দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলায় কৃষ্ণযাত্রার পরিবেশনায় অভিনয়শিল্পীদের দিকে তাকালে এক ভিন্ন চিত্র চোখে পড়ে। আলোচ্য অঞ্চলে কৃষ্ণযাত্রা 'বালক যাত্রা'-এর পর্যায়ভুক্ত অর্থাৎ শিশুশিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত। এ ব্যাপারে 'ঝাড়খণ্ডে মহাপ্রভু' গ্রন্থে ড. সুহৃদকুমার ভৌমিক 'ঝাড়খণ্ড সংস্কৃতি, ঝুমুর, টুয়া-সংগীত ও পদাবলী কীর্তন' অধ্যায়ে জানিয়েছেন, "বর্তমান লেখকের জন্মস্থান আমদাবাদ (পূর্ব মেদিনীপুর) গ্রামে পাঁচ ছয়টি বালক-সঙ্গীত বা কৃষ্ণযাত্রার পালাগানের দল আছে। মানভঞ্জন, নৌকাবিলাস, মাথুর প্রভৃতি পালাগুলি দশ বার বৎসরের ছেলেমেয়েদের লইয়া তাহারা গান করায়। ঐ দলগুলি সিংভূম, পুরুলিয়া, ধানবাদ, রাঁচি, হাজারিবাগ অঞ্চলে অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে বৎসরের আট-দশ মাসের জন্য বাহির হইয়া যায়।"[৩] 'জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ মেদিনীপুর' গ্রন্থে ড. ছন্দা ঘোষাল 'লোকসংগীত' প্রবন্ধে জানিয়েছেন, " 'কৃষ্ণযাত্রা' লোকপালা গীত-অভিনীত হয় মেদিনীপুরের দক্ষিণ এবং পশ্চিম উভয় অঞ্চলেই। তবে পশ্চিমাঞ্চলে তা 'বালিকা সংগীতে'র পর্যায়ভুক্ত। ... পশ্চিমাঞ্চলে মুখ্যত ছোট ছোট বালিকার দ্বারা এ পালা অভিনীত হয়, গীত হয় ...এতে ছয় থেকে দশ-বারো বছরের বালিকাদের অভিনয়ে সামিল করা হয়য়। তবে যে ক্ষেত্রে বালিকার চরিত্রের রূপায়ন সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে পুরুষ সেই অভিনয় করে দেয়।"[৪] লোকগবেষক ড. শ্যামল বেরা জানিয়েছেন, "বছর দশক আগেও গ্রাম-গঞ্জের উৎসব-অনুষ্ঠানে কৃষ্ণযাত্রার খুব সমাদর ছিল। এলাকা বিশেষে কৃষ্ণযাত্রা— 'কেষ্টযাত্রা', 'বালকযাত্রা', 'বালকসংগীত' নামেও পরিচিত।... রাধাকৃষ্ণের লীলাকথা নিয়ে মূলত বালক-বালিকারা অভিনয় করত, তাই নাম 'বালকযাত্রা'।"[৫] দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার কৃষ্ণযাত্রা পরিবেশনায় অভিনয়শিল্পী হিসেবে অংশগ্রহণ করত দশ-বারো থেকে পনেরো বছর বয়সী বালকেরা। বয়ঃসন্ধির লক্ষণ কণ্ঠস্বরে বা দৈহিক গঠনে ফুটে ওঠার আগে পর্যন্ত ছিল বয়সের ঊর্ধসীমা। নারী-পুরুষ উভয় চরিত্রে এরাই রূপ দান করত। নারী ভূমিকার জন্য কচিমুখ মিহি কণ্ঠস্বর যুক্ত ছেলেদের প্রাধান্য স্বীকৃত ছিল। অবশ্য কখনও কখনও তাদের সঙ্গে দু-একজন বয়স্ব পুরুষ অভিনেতাও চরিত্রাভিনয়ে অংশ নিতেন বিশেষত 'নৌকাবিলাস'-এ বৃদ্ধ বড়াই, 'নিমাই সন্ন্যাস'-এ শচীমাতার চরিত্রে। তবে যাত্রায় তখনও পর্যন্ত মহিলাদের অংশ নিতে দেখা যেত না। নারীচরিত্রে যেসব ছেলেরা অভিনয় করত তাদেরকে মেয়েদের মত চলন-বলন, ঠাঁট-বাঁট-অঙ্গভঙ্গি ও কণ্ঠস্বর অনুকরণ করতে হত।
- অধিকারী- কৃষ্ণযাত্রার দলে অধিকারীর ভূমিকা ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি একদিকে দলের প্রশিক্ষক, পালার বাঁধনদার, কোনো ক্ষেত্রে দলের ম্যানেজারও বটে। অপরদিকে মঞ্চাভিনয়ে তাঁর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ না থাকলেও অভিনয় চলাকালীন মঞ্চের একপাশে বসে তিনি পরিচালকের ভূমিকা নেন— যাত্রার গতি প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করেন, মূল কাহিনীধারায় প্রয়োজন মাফিক 'ছুট্' গান বা অতিরিক্ত প্রসঙ্গের অবতারণা করেন, অভিনেতাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন, বাদ্যযন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণ করেন। পালা পরিবেশনের সময় অভিনয়কে সংক্ষিপ্ত বা বাড়ানোর জন্য পরিচালক হিসেবে মুখ্য দায়িত্ব পালন করেন। অনেক তাঁকেই আবার স্মারকের ভূমিকায় সক্রিয় থেকে পুরো পালার সংলাপ, গীত প্রোম্‌ট করতে, ইশারায় অভিনয়শিল্পীদের বিভিন্ন ধরনের অভিনয়ের ইঙ্গিত দিতে দেখা যায়। সবার অলক্ষ্যে থেকেও তিনি সর্বত্র বিরাজমান।

- ‘পাথরে গোপাল’- দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলায় যাত্রাকারেরা কৃষ্ণযাত্রার পালায় নাট্যবহির্ভূত একটি অতিরিক্ত শিশু চরিত্রের কল্পনা করেছেন ‘পাথরে-গোপাল’ রূপে। অনেকে বলে থাকেন ‘ছোটো কৃষ্ণ’। রাধা-কৃষ্ণের লীলাভিনয়ে তাঁর কাজ হল কথকের। বাংলা লৌকিক নাট্যধারা কখনই কথকের বর্ণনা ব্যতীত নিরালম্ব চরিত্রাভিনয়ের মধ্য দিয়ে এগোয়নি। পাশ্চাত্য নাটকের ন্যায় নাট্যকার এখানে রঙ্গমঞ্চের আড়ালে নয়, নাট্যাভিনয়ে প্রথম থেকে শেষাবধি সশরীরে উপস্থিত থাকেন, কখনো সূত্রধার রূপে— অংকীয়া-নাটে, কখনো অধিকারী বা মূল গায়েন বা ‘গীদাল’-এর ভূমিকায়— কুষাণ, বিষহরীর পালাসহ উত্তরবঙ্গের লোকনাটকগুলিতে। কৃষ্ণযাত্রায় এই ভূমিকাটি পালন করে ‘পাথরে-গোপাল’। নাট্য উপস্থাপনায় একজন শিশু শিল্পী বাল-গোপালের বেশে দৃশ্যান্তরে বা নাট্য-ঘটনার ফাঁকে ফাঁকে এসে নৃত্য-গীতের মধ্য দিয়ে পরবর্তী দৃশ্যের প্রস্তাবনা করে যায়।

পরিবেশন রীতি - কৃষ্ণযাত্রার পালাগুলি সাংগীতিক, সংক্ষিপ্ত আয়তন বিশিষ্ট এবং কাহিনী একমুখীন। আসর জমে উঠলে অভিনেতব্য পালার সমাপ্তির পূর্বেই সরাসরি অপর একটি পালায় প্রবেশ করার সুযোগ থাকে। আসরের পাশে বসে এই তাৎক্ষণিক পরিবর্তনগুলি করেন ওস্তাদ নিজে। তাই প্রয়োজনে পালার পর পালা মালা গেঁথে সারা রাত ব্যাপীও চলতে পারে কৃষ্ণযাত্রার অভিনয়। যদিও উনিশ শতক থেকেই কৃষ্ণযাত্রার আর মৌখিক ঐতিহ্য ধারার নাট্য হয়ে থাকেনি, লিখিত ‘সাট’ বা পাণ্ডুলিপি ধরে চলেছে তার অভিনয়, তবে কখনও কখনও এই লিখিত নাট্যপাঠের অতিরিক্ত কথা-গান, ছোটো ছোটো নাট্য প্রসঙ্গ অভিনয়ের সময় তাৎক্ষণিকভাবে সংযোজন করার হত পালার আয়তনকে আড়ে-বহরে বাড়ানোর জন্য। সবটাই হত উপস্থিত দর্শকদের অভিরুচি বুঝে।

ক্ষেত্র সমীক্ষায় প্রাপ্ত নাটলিপিটিতে অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগ সহ স্থান উল্লেখ রয়েছে। সেই অনুসারে সংগৃহীত ‘মানভঞ্জন’ পালাটি অঙ্ক দৃশ্য বিশিষ্ট। এরূপ নাট্যনির্দেশনার প্রয়োগ এসেছে আধুনিক মঞ্চনাটক থেকে। আসলে পালার খসড়া লেখার সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যাত্রার বাঁধনদারেরা মঞ্চনাটকের পাণ্ডুলিপির ছাঁচ বা কায়াকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেন। যদিও লোকনাট্যের ক্ষেত্রে এই নাট্য নির্দেশনা গুরুত্বহীন। কারণ লোকনাট্য আসরের বস্তু, যে ঐতিহ্যবাহী মঞ্চে লোকনাট্য পরিবেশিত হয় সেখানে অঙ্ক বিভাজন, দৃশ্যপরিবর্তন দেখানোর মতো মঞ্চ-উপকরণের ব্যবস্থা থাকে না। তাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পালা এগিয়ে চলে কোনো একটানা নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে, কোনো মধ্যবর্তী ছেদ বা বিরতি ছাড়াই। আসরের সূচনা হয় ঘণ্টা বাজিয়ে, উপস্থিত দর্শকদের সচকিত করে। তারপর আসরে প্রবেশ করে ‘সখী দল’, বন্দনা-গীত পরিবেশন করতে।

বন্দনা:

মুরলীধারী গোপনন্দন কৃষ্ণের বন্দনার পদ দিয়ে পালার সূচনা। অভিনয়ের শুরুতে রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্তিতে রঙ্গস্থলে প্রকটিত হন এবং সখীরা ধূপ-পুষ্প-প্রদীপ ও শঙ্খ সহ নৃত্যের ভঙ্গিমায় ঘুরে ঘুরে তাঁদের চতুর্দিকে আবর্তন করে বন্দনা গীতটি পরিবেশন করেন—

জয় জয় রাধাবল্লভ দেবাদী দুর্লভ
ভব ভাব্য নিধি ভব দুঃখহারি
ওহে দীনবন্ধু দীনজনার বন্ধু
ভবসিন্ধুপারে তুমি হে কাণ্ডারী
ভব মাঝে হেরী বিপদ আকুল
কিসে পাব কুল ভেবে প্রাণাকুল
সগুণে নির্গুণে হয়ে সানুকুল

দেহ দেহ কুল গোকুল বিহারী
মতি যেন থাকে ঐ যুগল পদে
পড়লে বিপদে রেখো নিরাপদে
দাস গোবিন্দ বলে বিকায় যেন পদে
বিপদে ফেল না বিপদবারী।।

গৌরচন্দ্রিকা:

কৃষ্ণলীলার গৌরচন্দ্রিকার পদগুলি চৈতনোত্তর যুগের সংযোজন এবং তা এসেছে কীর্তনের ধারা থেকে। 'বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা' গ্রন্থে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য জানিয়েছেন— কৃষ্ণযাত্রার পালাবিভাগ, সঙ্গীত ও গৌরচন্দ্রী কীর্তন দ্বারা প্রভাবিত। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে খেতুরীতে নরোত্তম ঠাকুর কর্তৃক আয়োজিত কীর্তন-মহোৎসব থেকে যে পালাবন্দী কীর্তন গানের সূচনা হয়, তাতে প্রথমে চৈতন্যবন্দনার পদ দিয়ে গৌরচন্দ্রিকা করে রাধাকৃষ্ণলীলা গীত হওয়ার রীতি প্রচলিত হয়। ভক্ত বৈষ্ণবের কাছে 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত' গৌরাঙ্গের দিব্যলীলা হল অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের কৃষ্ণপ্রেম উপলব্ধির চাবিকাঠি। বৈষ্ণব মহাজন ও কীর্তনীয়ারা তাই রাধাকৃষ্ণ কথার বর্ণনা ও আস্বাদন করতে এবং ভক্তদের সেই আস্বাদ দান করতে কথামুখ হিসেবে 'গৌরচন্দ্রিকা'-র আশ্রয় গ্রহণ করেন।[৬] রূপগোস্বমীর 'বিদগ্ধমাধব' নাটকের প্রভাবে পালা-কীর্তনে গৌরচন্দ্রিকার সূচনা বলে অনুমান করা যেতে পারে কারণ, উল্লিখিত নাটকের প্রথমাংশে রূপগোস্বামী চৈতন্য বন্দনা করেছেন। কীর্তনে গৌরচন্দ্রিকা গাইবার বিধি প্রচলিত হওয়ার পর থেকেই কৃষ্ণযাত্রার পালায় "প্রত্যেক যাত্রাভিনয়ের মোহড়া স্বরূপ সর্বাগ্রে গৌরচন্দ্রী পাঠ"[৭] হতে শুরু করে।

পালাবদ্ধ কীর্তনে রাধাকৃষ্ণলীলার যে রসপর্যায়ের পালা গাওয়া হবে তার আগে গৌরলীলার সেই ভাবের, সেই অবস্থার পদ কীর্তন করে প্রয়োজনগত ও রসগত ঔচিত্য রক্ষা করা হয়। এইভাবে গৌরচন্দ্রিকা গাওয়ার ব্যবস্থাকে 'তদুচিত গৌরচন্দ্রিকা' বা 'বিশিষ্টার্থক গৌরচন্দ্রিকা' বলে।[৮] ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতে, যাত্রায় 'গৌরচন্দ্রী' পাঠ বা গৌরচন্দ্রিকা গান ছিল পালাকীর্তনের 'তদুচিত গৌরচন্দ্র'-এর মতো।[৯] এই গৌরচন্দ্রিকা গান থেকেই সেদিনের অভিনেয় পালার আভাস পাওয়া যেত। কিন্তু সংগৃহীত 'মানভঞ্জন পালা'য় গৌরচন্দ্রিকা গাইবার ক্ষেত্রে এরূপ নির্দিষ্ট রসপর্যায়গত ঐক্য রক্ষা করা হয়নি। তবে দুটি পদেই কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর শ্রীচৈতন্যের ভাবাভিব্যক্তি প্রতিফলিত হয়েছে।

নাটলিপিতে কৃষ্ণবন্দনার পরবর্তী দুটি পদ গৌরচন্দ্র চৈতন্যের বন্দনামূলক। প্রথম পদটি পরিবেশিত হয় একক সংগীত রূপে বৃন্দার কণ্ঠে। কারণ বৃন্দাই এ নাটকের প্রধান অনুঘটক। শ্রীরাধার মান ও মান পরবর্তী মিলনে প্রধান ভূমিকা তাঁরই। তাই আসরের শুরুতে তিনি যুগলাবতার গৌরাঙ্গের পাদপদ্মে প্রণতি জানিয়ে 'মানভঞ্জন পালা'র শুভারম্ভ ঘোষণা করেন। আলোচ্য পদটি শ্রীচৈতন্যের অন্ত্যলীলার পদ, গোবিন্দ দাস অধিকারীর 'মানভঞ্জন পালা' থেকে পালাকার গ্রহণ করেছেন। পদটিতে রাধাভাবেভাবিত গৌরাঙ্গের দিব্যোন্মাদ অবস্থার ছবি ফুটে ওঠে—

বৃন্দা: [গান]

গোরার মনে হল ব্রজধাম নন্দের নন্দন শ্যাম
ধরি কাঁদে আপন চরণে
মনে হল ব্রজপুরী গদাধরের মুখ হেরী
ঝর ঝর ঝরয়ে নয়নে
রাইকো ভাবে ভরা প্রলাপ করয়ে গোরা

কাঁদি কহে বিনয় বচন

এতেক দেখিয়া মনে গোরা কাঁদে রাত্র দিনে

গোবিন্দ দাসের নিবেদন।।

দ্বিতীয় গানটি পদকর্তার। দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলায় কৃষ্ণযাত্রার পদকর্তার গীতগুলি পরিবেশন করে কথক রূপী 'পাথরে-গোপাল'। তার অঙ্গুলীতেই বাঁধা থাকে কাহিনীর ডোর। সে যেমন নাট্যাভিনয়ের মাঝে আসরে উপস্থিত হয়ে গীতাভিনয়ের দ্বারা পরবর্তী আখ্যানাংশ বর্ণনা করে যায় তেমনি যাত্রার প্রারম্ভে উপস্থিত হয়ে গৌরচন্দ্রিকার পদ পরিবেশন করেন।

পদকর্তা: [গান]

দিন অবসান দেখি শচির নন্দন গো

প্রেমাবেশে ছল ছল অরুণ নয়ন গো।

বিরস বদনে কহে সুমধুর ভাষ

সহচর সনে গোরা চলে নিজ বাস গো।

বিদায় হইয়া সবে নিজঘরে গেল,

জননী ধাইয়া গোরাচাঁদ কোলে নিল গো।।

রাধাকৃষ্ণের লীলাভিনয়ের পূর্বে এই গৌরচন্দ্রিকার পদগুলি গাইবার উদ্দেশ্য হল দর্শকদের হৃদয়পটে 'প্রেম-ভক্তি' আস্বাদনের উপযুক্ত 'জমি' পত্তন করা। গৌরলীলার সাহায্যেই উপস্থিত দর্শকেরা রাধাকৃষ্ণলীলার মধ্যে যথাযথভাবে এবং সহজে অনুপ্রবেশের অধিকার অর্জন করেন।

মূল পালা:

বন্দনা ও গৌরচন্দ্রিকার পর মূল পালায় প্রবেশ। নাট্যকাহিনী অনুসারে চরিত্রাভিনেতারা আসরে প্রবেশ করে সংলাপ, নৃত্য, গীতের সমন্বয়ে চরিত্রাভিনয়ের মধ্য দিয়ে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যান।

চরিত্র- রাধাকৃষ্ণলীলার এক একটি পর্ব বা শ্রীচৈতন্যের দিব্যময় জীবনের এক একটি লীলা পালাগুলির উপজীব্য। তাই বহু চরিত্রের সমাবেশ এ যাত্রায় দেখা যায় না। আলোচ্য 'মানভঞ্জন' পালাতে চরিত্র সংখ্যা সাত। কৃষ্ণ ব্যতীত বাকী চরিত্রগুলি নারী চরিত্র। যথা:

নারী চরিত্র	পুরুষ চরিত্র
রাধা, বৃন্দা, ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলী, পদ্মা	কৃষ্ণ

সংলাপ- আলোচ্য পালার অভিনয় উপাদানগুলির মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হল সংলাপ। সমগ্র অখ্যানভাগ মূলত সংলাপাত্মক অভিনয়ের দ্বারাই পরিবেশিত হয়। প্রস্তাবনা অংশের পরই চরিত্রাভিনেতারা সরাসরি সংলাপাত্মক অভিনয়ে প্রবেশ করেন—

> "রাধা- ললিতে বনফুল তুলে এনে যত্ন করে আমার বাসর সজ্জা করে দাও।
>
> ললিতা- শ্রীমতী, আজ আবার যত্ন করে বাসর সজ্জা কি জন্য? তবে কি শ্যামাচাঁদ আজ কুঞ্জে উদয় হবেন নাকি?
>
> রাধা- হ্যাঁ ললিতে। আমার প্রাণবল্লভ বলে গেছেন, প্যারী তুমি বাসর সজ্জা করে রেখো। আমি তোমার কুঞ্জে আসব। তাই বলছি যাও সখীগণ তোমরা বনফুল তলে এনে আমার বাসর সজ্জা করে দাও। ললিতা, বিশাখা, যাও তোমরা বনফুল তুলে আনগে।..."

এইভাবে সংলাপাত্মক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে নাট্যকাহিনীর সূচনা। নাট্য উপস্থাপনায় এরূপ সংক্ষিপ্ত নাট্যিক সংলাপ চিরপরিচিত কাহিনীর এলায়িত কাঠামোয় গতি সঞ্চার করত। আলোচ্য পালায় সংলাপ প্রক্ষেপণে দ্বিবিধ রীতি অনুসৃত হত। যথা— পাঠ ও সুর সহযোগে উচ্চারণ।

- সুরাত্মক সংলাপ:

গোবিন্দ অধিকারীর পালায় গদ্য সংলাপ পরিবেশনার জন্য যে পাঁচালির সুরাত্মক বাকরীতি গ্রহণ করা হয়েছিল সে রীতি আলোচ্য পালাতেও অনুসরণ করা হয়েছে। চরিত্রাভিনেতারা স্বাভাবিক কথোপকথনের মাঝে কখনও সংলাপের কিছু অংশ সুর করে বলে ওঠেন। সংলাপের কোথায় সুরের প্রয়োগ হবে তার নির্দেশ নাটলিপিতে রয়েছে। আলোচ্য পালা থেকে এরূপ সুরাত্মক সংলাপের দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো—
দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য- 'বাসকসজ্জিকা' চন্দ্রাবলী কৃষ্ণ মিলনের জন্য আকুল—

"পদ্মা- (সুরে) বলি ওগো চন্দ্রাবলী
আজ কেন তুই কেঁদে উঠলি
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে।
(কথা) ও মা তোকে আবার কালা জ্বর ধরলো নাকি লা!
(সুরে) ও যে কাঁদিয়ে মারে গো,
যে জন কৃষ্ণ বলে কাঁদে।
চন্দ্রা- (সুরে) না হয় আমি কেঁদে মরিব,
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে।
(কথা) সখীরে তুই আমার প্রাণবধূকে এনে দিতে পারবি কিনা বল।
পদ্মা- (কথা) কেন পারবো না!
(সুরে) আমি কারে না ডরাই / বৃন্দাবনে ঘুরে বেড়াই
(কথা) ঐ পথ দিয়ে কৃষ্ণ রাইয়ের কুঞ্জে গমন করেন। চল ঐ পথে গিয়ে দাঁড়াই। পথে গেলে কৃষ্ণ পেতে পারি..."

এছাড়া সম্বোধন-সম্ভাষণের ক্ষেত্রেও সুরের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন, তৃতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্যে বৃন্দার রাধার প্রতি সম্ভাষণ—

"বৃন্দা: (সুরে) রাজনন্দিনী প্রেম সঙ্গিনী, শ্যাম গরবে গরবিনী রমণীর শিরোমণি।"

এই বলে বৃন্দা দূতী রাধাকে কৃষ্ণের আগমন সংবাদ জানালেন।

উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলি হতে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে বিবর্তনের ধারায় কৃষ্ণযাত্রায় সংলাপের গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পেলেও বিশুদ্ধ এবং অবিমিশ্র গদ্য সংলাপ এই যাত্রায় দেখা যায় না। বরং সংলাপ এখানে সঙ্গীতের হাত ধরে হেঁটেছে। সংলাপ প্রক্ষেপণে সাধারণ কথ্যভঙ্গীর পাশাপাশি সুরাত্মক রীতির যুগৎপত প্রয়োগে অভিনয়ের শুরু থেকে শেষাবধি এক নিরবিচ্ছিন্ন সুরের রেশ প্রবাহিত হয়ে এর সাংগীতিক ধর্ম অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

এ ধরনের সুরেলা কথন ভঙ্গী ঐতিহ্যগত অভিনয়রীতির একটি বৈশিষ্ট্য। নেপালের ভাষানাটকে ও অংকীয়ানাটে অধিকারী বা সূত্রধরের সংলাপে এই সুরেলা গীতল গদ্যের ব্যবহার দেখা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর যাত্রাগানে সংলাপ পরিবেশনের যে চিত্রটি 'বঙ্গদর্শন'-এ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তুলে ধরেছেন তাতেও এই সুরাত্মক ভঙ্গীটি ধরা পড়ে— "সাবেক যাত্রাওয়ালারা কথাবার্তা সুরে কহিত এবং সুরের নিমিত্ত কথা একটু টানিয়া কহিত।"[১০] খোলা জায়গায় বহু সংখ্যক লোকের শ্রুতিরঞ্জনের প্রতি লক্ষ্য রেখে অভিনয় ক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয় বলে একসময় যাত্রাভিনয়ে উচ্চস্বরে প্রলম্বিত সুরে নিবন্ধ সংলাপ প্রক্ষেপণের রীতি প্রচলিত হয়েছিল।

কি পদ্য কি গদ্য— সবেতেই সুরের প্রয়োগ। কণ্ঠস্বরকে কোন স্বরগ্রামে বাঁধলে দূরস্থ শ্রোতৃবৃন্দের কাছে পৌঁছানো সম্ভবপর হবে তা যাত্রার কুশীলবরা জানতেন। সে সুর অতি তীব্র ছিল না অথচ তা সকল কলরব ছাপিয়ে উঠত। মুক্তমঞ্চে বৈদ্যুতিক মাইক্রোফোনের ব্যবহার ছাড়া কেবলমাত্র কণ্ঠস্বররের ওপর নির্ভর করে অভিনয় পরিবেশন করা সত্ত্বেও সংলাপের প্রতিটি কথা উপস্থিত শ্রোতাদের কাছে স্পষ্ট ও বোধগম্য হয়ে উঠত সুরের এই বিশেষ গুণের কারণে।

- পদ্য সংলাপ:

সংগৃহীত নাটলিপি অনুসরণে বলা যায়, চরিত্রানুযায়ী সংলাপাত্মক অভিনয় পরিবেশনে কুশীলবরা গদ্যসংলাপ ছাড়াও অনেক সময় কথোপকথনের মাঝে সংক্ষিপ্ত ছড়া বা ছন্দোবদ্ধ উক্তি ব্যবহার করতেন। একটানা গদ্যাভিনয়ের ফাঁকে এ ধরনের গদ্য-পদ্য মিশ্রিত সংলাপ প্রয়োগ করা হত মূলত বৈচিত্র্য আনতে। যেমন— রাইকে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে ক্রমাগত অশ্রুবিসর্জন করতে দেখে এবং রাইয়ের নিকট কোনো সাড়া না পেয়ে ললিতা ও বিশাখা ডাকতে গেলেন তাঁদের প্রধান মন্ত্রণাদাতা বৃন্দাকে। তাঁদের ডাকে বৃন্দার উত্তর— "কিসের তরে ললিতা রে, ডাকলি আমায় বল প্রকাশ করে।" এরূপ অন্ত্যমিলযুক্ত সংলাপ সুর সহযোগে আবৃত্ত হত।

পাঁচালির ঢঙে ছড়াকাটার রীতি কৃষ্ণযাত্রায় প্রবেশ করে উনিশ শতকে, গোবিন্দ অধিকারীর হাত ধরে। এ ব্যাপারে তিনি দাশরথী রায়ের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। নব্য পাঁচালির ছড়া কাটানোর রীতিকে গোবিন্দ অধিকারী তাঁর পালায় ব্যবহার করেছিলেন সংলাপাত্মক অভিনয়ের বিশিষ্ট রীতি হিসেবে, যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ শুক-সারীর পালা, চূড়া-নুপূর দ্বন্দ্ব প্রভৃতি নাট্যগুণ সমৃদ্ধ উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক পয়ারগুলি। দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলায় প্রচলিত কৃষ্ণযাত্রাতেও এ জাতীয় 'পয়ার-কাটান'-এর সন্ধান মেলে—

তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য- চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে নিশি অতিবাহিত করে সর্বাঙ্গে রতিবিলাসের চিহ্ন ধারণ করে কৃষ্ণ এলেন রাইয়ের কুঞ্জে। কিন্তু বৃন্দা তাঁকে এত সহজে রাইয়ের কাছে যেতে দিতে নারাজ। তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে পূর্ব রাত্রিযাপনের কথা গোপন রাখা সম্ভবপর হল না। এরপর শুরু হল প্রশ্ন-উত্তর পর্ব। বৃন্দা প্রতিটি রতিচিহ্ন নির্দেশ করে কৃষ্ণকে অভিযুক্ত করেন এবং কৃষ্ণ একটি করে কাল্পনিক ব্যাখ্যা হাজির করে অভিযোগ খণ্ডানোর প্রচেষ্টা করেন—

> "বৃন্দা: না ঠাকুর মিথ্যা কথা বলছেন। আপনি যে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে নিশি জাগরণ করেছিলেন তার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে যে।
> কৃষ্ণ: কি চিহ্ন পেয়েছ বল?
> বৃন্দা: *নীলোৎপল শ্রীমুখ মণ্ডল ঝামর কাঁহে ভেল।*
> ঠাকুর তোমার বদনখানি আজ নীলবর্ণ হয়েছে। একটু ঝিমিয়ে পড়েছে দেখছি যেন।
> কৃষ্ণ: *মদন জ্বরে তনুতাতল জাগরে নিশি ভেল।*
> ওগো বৃন্দে গতরাত্রে আমার মদন জ্বর হয়েছিল, তাই আমার বদনটা শুকিয়ে গেছে।
> বৃন্দা: আরও চিহ্ন আছে।
> কৃষ্ণ: আবার কি চিহ্ন দেখলে বৃন্দে
> বৃন্দা: *নখ নির্ঘাত ক্ষত বক্ষসি দেওল কোন নারী।*
> হ্যাঁ ঠাকুর তোমার বুকের মাঝে আজ কোন রমণী নখ দিয়ে আঁচড়ে দিয়েছে?
> কৃষ্ণ: *কন্টকে তনু ক্ষত বিক্ষত তুঁহে ঢুড়ইতে গোরি।*
> ওগো বৃন্দে আমি গোরি সেবা করার জন্য বেলফুল তুলতে গিয়েছিলাম সেই বেলগাছের কাঁটাতে আমার অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে।

বৃন্দা: *সিঁদুর কাঁহে অলকপরি চন্দন কাঁহা গেল।*
বলি ঠাকুর চন্দনের স্থানে সিঁদুর দেখছি কেন?
কৃষ্ণ: *গিরি গোবর্ধনে গৈরিক সেবি সিঁদুর শিরে নেল।*
ওগো বৃন্দে আমি গৌরী সেবা করে যখন গিরি পর্বতে প্রণাম করি সেই সময়ে ভালে সেই গিরি পর্বতের মাটি লেগেছে , এ সিঁদুর নয়।
বৃন্দা: *নীলাম্বর তহুঁ পাহরলী পীতাম্বর কাঁহা ছোড়ি।*
বলি ঠাকুর আপনার সেই পীতাম্বর কই, কোটি দেশে আজ নীলাম্বর দেখছি কেন?
কৃষ্ণ: *অগ্রজ সহ পরিবর্ত্তিত নন্দালয়ে ভোরি।*
ওগো বৃন্দে নিশিথে আমি বলাই দাদার সঙ্গে শুয়ে ছিলাম তাই বসনটা তাঁর সঙ্গে পালটে গিয়েছে। বৃন্দে কেন মিছে দোষ দিচ্ছ, আমি নির্দোষ আমার নাই কোন দোষ।
বৃন্দা: শ্যাম কেন কর শঠতা। তোমায় চিনতে আমার বাকী নাই।...”

এখানে ‘খণ্ডিতা’-র একটি পদকে উত্তর-প্রত্যুত্তর রূপে বিন্যস্ত করা হয়েছে। উদ্ধৃত বাদানুবাদে কথ্য গদ্যের সঙ্গে ছন্দোবদ্ধ পদের সংযোজনে নাট্য উপস্থাপনাকালে সংলাপগুলি আবৃত্ত হওয়ার সময় যে ছন্দের দোলা সঞ্চারিত হয় তাতে সংলাপের নাটকীয়তা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। এর পাশাপাশি এ ধরনের ছন্দোময় ‘কাটান-জবাব’-এর ছদ্ম সামরিকতায় যে নাটকীয় উত্তেজনা সঞ্চারিত হত তা সমবেত দর্শক মণ্ডলীকে আনন্দিত ও উল্লসিত করত।

- বর্ণাত্মক সংলাপ:

এই পালায় সংলাপাত্মক অভিনয়ও স্থানে স্থানে বর্ণনার দ্বারা আক্রান্ত। চরিত্রাভিনয়ের সময় কুশীলবরা গদ্য সংলাপের পাশাপাশি বর্ণনাধর্মী গদ্যের সাহায্য নেন। বিশেষত স্বগত উক্তিগুলিতে এ ধরনের বর্ণানাত্মক গদ্যের সন্ধান মেলে। যেমন,

দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য- পূর্ব সংকেত অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ চলেছেন রাত্রি অভিসারে। যেতে যেতে তাঁর স্বগত উক্তি—

> “কৃষ্ণ- (স্বগত) এতক্ষণে শ্রীমতী নিশ্চয়ই কুঞ্জ মধ্যে আমার জন্য অপেক্ষা করে আছেন। আর বিলম্ব করা উচিত নয়। কি করবো ঘর থেকে তো বেরোতে পারা যায় না। মা যশোদার চোখের আড়াল হওয়ার উপায় নাই। কানাই কানাই বলে দাদা বলরাম ডেকে অস্থির। যাক! কোনো রকমে বেরিয়ে এসেছি। কিন্তু একি! আজ আমায় ধরবার জন্য চন্দ্রার দাসী পদ্মা পথের মাঝে লুকিয়ে আছে। আমিও পায়ের নুপূর খুলে চুপি চুপি চলে যাই।”

গান- একসময় কৃষ্ণযাত্রা ছিল পুরোদস্তুর সংগীতময়, যৎসামান্য কাহিনীসূত্রকে অবলম্বন করে সংগীতের পর সংগীতের সংযোজনা। তারপর জনরুচির বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গদ্য সংলাপ প্রবেশ করলেও কৃষ্ণযাত্রায় গানের সংখ্যা কখনও কমেনি। দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলায় কৃষ্ণযাত্রার মূল আকর্ষণই ছিল এর নৃত্য-গীত। দলের জনপ্রিয়তা নির্ভর করত অভিনয়কারী বালকদের সাংগীতিক দক্ষতার ওপর। গানের সুর মূলত কীর্তনাঙ্গ। সুর সম্পাদনায় পালাকাররা ঢপকীর্তনের নানা সুরপ্রণালীর অনুসরণ করতেন। তবে ক্ষেত্রসমীক্ষায় জানা গেছে এ সকল পদাবলী ঘরানার সুরের পাশাপাশি দর্শকের অভিরুচির সঙ্গে তাল মেলাতে পরবর্তীকালে কোনো কোনো ওস্তাদ কৃষ্ণযাত্রায় প্রচলিত লোকসংগীতের সুর, এমন কি চটুল জনপ্রিয় গানের সুর প্রয়োগ করে আধুনিকীকরণের চেষ্টা করেছেন। তবে প্রবীণ শিল্পীদের মতে এতে কৃষ্ণযাত্রার পৌরাণিক ভাব-গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ণ হয়। আলোচ্য ‘মানভঞ্জন’ পালার গানগুলির মধ্যে পালাকারের স্বরচিত গান ছাড়াও বহু পরিচিত লোকপ্রিয় মহাজন পদের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয় । যেমন—

প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য- বিনোদিনী বাসর সাজিয়ে দয়িতের পথ-পানে চেয়ে বসে রয়েছেন। বঁধূর সঙ্গে মিলনের রজনী আজ। কিন্তু রাত্রি গত হয়ে প্রভাতের আলো ফুটে উঠেছে, কান্তের দেখা নেই। রাধা ভক্তিভরে আকুল হয়ে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করলেন, তারপর গান—

"রাধা: [গান]

ওগো বঁধুর লাগিয়া শেজ বিছাইনু
গাঁথিনু ফুলের মালা
তাম্বুল সাজিনু দীপ উজারিনু
মন্দির হইল আলা
সই, পাছে এসব হয় গো আন
সে যে নাগর গুণের সাগর
কাঁহে না মিলিল কান
শাশুড়ী ননদে বঞ্চনা করিয়া
আইনু গহনে বনে
বড় সাধ মনে এ নব যৌবনে
মিলিব বঁধূর সনে
পথ পানে চাহি কতো না রহিব
কত প্রবোধিব মনে
রস শিরোমণি আসিবে এখনি
দাস গোবিন্দ ভণে।।"

পদটি 'বড়ু চণ্ডীদাস' রচিত। মহাজন পদগুলি মৌখিক ঐতিহ্যবাহী, গুরু-শিষ্য পরম্পরায় বহমান। তাই শ্রুতি-স্মৃতির বিচ্যুতিতে বহু শব্দের বিলোপন-পরিবর্তন ঘটেছে। এমনকি ভণিতায় পদকর্তার নামেরও রদ-বদল ঘটে। যেমনটা এক্ষেত্রে ঘটেছে। মহাজন পদ ব্যতীত পালার অন্যান্য গানগুলিতে এরূপ ভণিতার ব্যবহার নেই। উপস্থাপনের বিচারে আলোচ্য পালার গানগুলিকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা—

- সংলাপাত্মক গান:-

সংলাপাত্মক অভিনয় উপাদানগুলির মধ্যে অন্যতম হল সংগীত। আলোচ্য পালায় সংলাপ পরিবেশনে গদ্য-পদ্যের পাশাপাশি সংগীতের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এধরনের নাতিদীর্ঘ গীতিসংলাপগুলি সংশ্লিষ্ট চরিত্রের কণ্ঠে উপযুক্ত ভাবাভিনয় সহ পরিবেশিত হয়। ধ্রুবপদের ব্যবহার না থাকায় কৃষ্ণযাত্রায় সংগীত পরিবেশনার ক্ষেত্রে দোহারের প্রয়োজন হয় না। সংগীতনির্ভর এই পালায় সংগীত উপস্থাপনায় এক বিশেষ রীতি অনুসৃত হয়— কুশীলবরা গানের একটি করে কলি গাইবার পর বাদ্যকারেরা সমবেত বাদনের মধ্য দিয়ে সেই সুরটি উচ্চগ্রামে প্রতিধ্বনিত করেন তারপর গানের পরবর্তী কলিটি পরিবেশন করা হয়। এইভাবে গীত-বাদ্যে আসর মেতে ওঠে। সংগৃহীত পালা থেকে এরূপ সংলাপাত্মক গীতাভিনয়ের দৃষ্টান্ত প্রদান করা হলো—

কৃষ্ণ না আসায় রাধা মনোকষ্টে ভূমিশয্যা গ্রহণ করেছেন। সখীদের সঙ্গে বাক্যালাপও বন্ধ। সখীরা গেলেন বৃন্দাকে ডাকতে। বৃন্দাকে পেয়ে রাধা তাঁর হৃদয়ভঙ্গের কথা জানাচ্ছেন প্রথমে গদ্যে, তারপর গানে—

> "রাধা: (সংলাপ) এস এস প্রাণের সখী বৃন্দে, তোমরা এলে কিন্তু আমার কালাচাঁদও এখনও এলেন না। সখী আকাশের চাঁদ যে অস্তাচলে চলে গেল তবু আমার হৃদয়চাঁদ শ্যামচাঁদের দেখা নাই কেন বৃন্দে? জানিস গো যদি বল, আমার নয়নচাঁদ কৃষ্ণ কই?

[গান]

বৃন্দে গো, কই গো কই বৃন্দাবন চাঁদ
অস্তাচলে চলে ঐ গগনচাঁদ।
গেল শর্বরী অনুমান করি,
কোন চকোরী উদয়চাঁদ হেরি,
বুঝি ফাঁদ পেতে ধরেছে আমার কালাচাঁদ।
বিনে শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণপক্ষ,
যে পক্ষে হয় শুক্লপক্ষ,
সেই পক্ষে সপক্ষ প্রাণনাথ।
এ পক্ষে আঘাত যেন পক্ষাঘাত,
এ কি ব্যাঘাত বিনা মেঘে বজ্রপাত
নেত্রে শিলাঘাত হতেছে নক্ষত্রচাঁদ।।”

এভাবে রাধিকা তাঁর মনের ভার লাঘব করেছেন গানের মধ্য দিয়ে। সংলাপের সঙ্গে সংযোজিত এই উক্তিগীতগুলি যেন সংলাপেরই সম্প্রসারিত অংশ— চরিত্রের হৃদয়াভিব্যক্তির প্রকাশক, বক্তব্যের ধারক। আসলে যাত্রাভিনয়ে লোকরুচি ও শ্রোতার সংখ্যা উভয় দিকেই লক্ষ্য রাখা হয়। খোলা আসরে সমবেত সহস্রাধিক দর্শকবৃন্দের মধ্যে ভাবাবেগের সঞ্চারের জন্য গদ্য সংলাপ যথেষ্ঠ বলে বিবেচিত না হওয়ায় লোকযাত্রার পালাকাররা কথ্য-সংলাপের সঙ্গে তার রেশ ধরে এ ধরনের সংলাপাত্মক-গীত সংযোজন করেন।

- সাংগীতিক উক্তি-প্রত্যুক্তি:-

অভিনয়কালে, সংলাপাত্মক গদ্যাভিনয়ের মাঝে বিভিন্ন সময় সংক্ষিপ্ত উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক গানের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। গানকে এখানে কথোপকথনের বিশেষ রীতি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যেমন—

দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্যে পদ্মা পথ হতে কৃষ্ণকে পাকড়াও করে নিয়ে এসেছেন চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাই পালানোর নানা ছুতো খুঁজছেন। এদিকে এতদিন পর প্রাণসখাকে পেয়ে চন্দ্রাবলী তাঁকে কিছুতেই তাঁকে যেতে দিতে নারাজ, প্রেমডোরে আবদ্ধ করলেন তাঁকে। এই অংশে উভয়েরই কথোপকথন গীতি-আধারে পরিবেশিত হয়ে নাট্য-উত্তেজনা সৃষ্টিতে সাহায্য করে—

“চন্দ্রা: [গান]

পূজা করিব, এস এস এস বঁধু
মন চন্দন তুলসী দিয়ে।।

কৃষ্ণ: [গান]

আজি ছেড়ে দাও চন্দ্রে
আজি ছেড়ে দাও,
শ্রীদাম ডাকছে যাব তার কাছে।
এই নিবেদন করি গো চন্দ্রে,
শ্রীদাম ডাকছে যাব তার কাছে।।

চন্দ্রা: [গান]

পেলে তোমায় কেবা ছাড়ে
যোগী পায় না যোগসাধনে।

কৃষ্ণ: [গান]

কালী আসি হাম পুরাইব কাম
ইছে নাহি কর রোষ
চন্দ্রাবলী নাথ ভুবনে বিদতে
জগতে ঘোষয়ে দোষ
তুমি যে আমার আমি যে তোমার
বিবাদে কি কাজ আছে
লোকে জানাজানি কেন কর ধনী
পিরিতী ভাঙ্গিবে পাছে।
লোকে যেন জানে না গো,
জানলে পরে লাজের কথা।।

চন্দ্রা: [গান]

বঁধু আর কি ছাড়িয়া দিব?
আমার এ বুক ছিঁড়িয়া যেখানে পরাণ
সেখানে তোমায় রাখিব।
ছেড়ে যে দেব না,
হৃদয় মাঝে রাখব তোমায়।।"

যাত্রাগানে এধরনের সাংগীতিক উত্তর-প্রত্যুত্তর নাট্যাভিনয়কে বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল করে তোলে। বিশেষ বিশেষ নাট্য পরিস্থিতিতে ভাবোত্তেজনা সৃষ্টির জন্য যাত্রাকারেরা এরূপ চূর্ণ উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক গীত ব্যবহার করে থাকেন।

- বর্ণনাত্মক গান:

পাত্রপাত্রীর গান ছাড়াও আলোচ্য পালায় কিছু অতিরিক্ত বর্ণনাধর্মী গান সংযোজিত হতে দেখা যায় তবে তা সংখ্যার বিচারে স্বল্পই। চরিত্রাভিনয়ের মধ্যে এধরনের বর্ণনাত্মক গানের অবতারণা করে পালাকার ঘটনা-পরম্পরায় সংযোগসূত্র স্থাপন করেন, দৃশ্যান্তর ঘটান, পরবর্তী ঘটনার চুম্বক জ্ঞাপন করেন, চরিত্রসমূহের কার্যাবলী এবং ব্যবহার দর্শকের বোধগম্য হওয়ার ব্যাপারে সহায়তা করেন। অর্থাৎ কৃষ্ণযাত্রায় এধরনের বর্ণনাত্মক গানের ভূমিকা 'অংকীয়া-নাট'-এর 'সূত্রধার'-এর গদ্যাত্মক বর্ণনা বা ব্যাখ্যার সমতুল্য। নাটলিপিতে এই গানগুলি পদকর্তার গান রূপে চিহ্নিত, নাট্যাভিনয়ের সময় তা উপস্থাপনা করে 'পাথরে-গোপাল'। চরিত্রাভিনয়ের দ্বারা নাট্যকাহিনী এগিয়ে যাওয়ার ফাঁকে 'পাথরে-গোপাল' এসে দুই হাতে তালি বাজিয়ে আসরের চারিদিকে বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে নৃত্যের মধ্য দিয়ে এ ধরনের বর্ণনামূলক গীত পরিবেশন করে। কৃষ্ণযাত্রায় 'পাথরে-গোপাল'ই কাহিনী বৃত্তের বাইরে থাকা সর্বজ্ঞ কথক। গানের মধ্য দিয়ে সম্মুখস্থ দর্শকদের পরবর্তী ঘটনার পূর্বাভাস জানান দিয়ে যায়। যেমন—

তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্যে কৃষ্ণের প্রতি প্রতিশোধ নিতে বৃন্দার পরামর্শে রাধা 'মানিনী' হলেন। কেশসজ্জা খুলে ফেলে আলুলায়িত কেশে, অবগুণ্ঠনে মুখমণ্ডল আবৃত করে, গলার মুক্তামালা খণ্ডিত করে মানিনীর বেশে রাধা কুঞ্জে উপবেশন করলেন। এমন সময়ে পদকর্তা এসে জানিয়ে গেল কৃষ্ণের আগমন সংবাদ—

[পদকর্তার গান]
চন্দ্রাবলী সনে কুসুম শয়নে,
সুখেতে ছিলেন শ্যাম।
প্রভাতে উঠিয়া ঢলিয়া ঢলিয়া,
আইসে রাধার ঠাঁই ।
নাগর আসিতেছে,
কালা ধীরে ধীরে আসিতেছে।।

মঞ্চে সখীবেশী নর্তকেরা নৃত্যের ছন্দে ঘুরে ঘুরে এই গান পরিবেশনের পর অভিনেতারা পুনরায় মঞ্চে প্রবেশ করে পূর্বের সংলাপাত্মক রীতি অবলম্বন করে নাট্যাভিনয়ে অংশ নেন।

একটানা সংলাপাত্মক অভিনয়ের মাঝে এরূপ সমবেত নৃত্য-গীত পরিবেশনা নাট্য উপস্থাপনায় বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। তাছাড়া আসন্ন ঘটনার প্রচ্ছন্ন ছায়াপাতে পদকর্তাদের কণ্ঠে এই গানগুলি দর্শকদের মধ্যে কৌতূহল সঞ্চার করে দিয়ে যায়। তাই নাট্য রূপায়নে নাট্যিক ঔৎসুক্য তৈরীর কৌশল রূপে পালাকারেরা এধরনের বর্ণনামূলক গান প্রয়োগ করেন।

বাংলায় কৃষ্ণযাত্রার পালাগুলি বিশ্লেষণ করলে দুটি ধারা চোখে পড়ে। কোনো কোনো পালাকার পালা রচনায় সংগীতের থেকে সংলাপকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। গদ্য সংলাপের প্রয়োগে সঙ্গীতের এককেন্দ্রিকতা অপসারিত হয়ে গীত ও সংলাপ যৌথ ভাবে পরিবেশনায় অংশ নিয়েছে। ফলে কৃষ্ণযাত্রা তার সাবেক সংগীতনির্ভর আদল ছেড়ে ক্রমশ গীতাভিনয়ের দিকে অগ্রসর হয়েছে। আবার কেউ কেউ পালা সাজিয়েছেন সংগীতের জাল বুনে। আনুপূর্বিক সংগীত দ্বারা গ্রন্থিত এই পালাগুলি যেন কীর্তন পালারই নাট্যরূপ, গদ্য সংলাপ প্রায় নেই বললেই চলে। প্রথম ধারাটি পরমানন্দ অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারী, নীলকমল মুখোপাধ্যায় প্রমুখের দ্বারা ক্রমবিবর্তিত হয়েছে। আর দ্বিতীয় ধারাটিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন কৃষ্ণকমল গোস্বামী, রসিকলাল চক্রবর্তী প্রমুখেরা।

বাংলা-ওড়িশা সীমান্তে 'বালক-যাত্রা' রূপে যে কৃষ্ণযাত্রা অভিনীত হত তা এই প্রথম ধারার অনুবর্তী। নাট্য পরিবেশনায় এখানে সংলাপ ও সংগীত প্রায় মর্যাদা লাভ করেছে। কীর্তনাঙ্গ গানগুলি এর 'আত্মা' স্বরূপ, আর সংলাপ নির্মাণ করেছে এর বহিরঙ্গের কায়া। সংলাপের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বাচিক অভিনয় ও ভাবাভিব্যক্তির গুরুত্বও বেড়েছে। কিন্তু সংলাপাত্মক অভিনয়ও এখানে বিশুদ্ধ গদ্যের পথ ধরে হাঁটেনি। সুরময় পদ্য-সংলাপ, ছন্দোবদ্ধ উক্তি-প্রত্যুক্তি, সংলাপধর্মী গীত— প্রভৃতি উপাদানের মিশ্রিত প্রয়োগের মাধ্যমে কুশীলবরা সংলাপাত্মক অভিনয়ে অংশ নিয়েছেন। আবার চরিত্রাভিনয়ের মধ্যে বর্ণনাত্মক সংলাপের ব্যবহারে, দৃশ্যান্তরে 'পাথরে-গোপালের' গানের মধ্য দিয়ে কাহিনী-কথনে বর্ণনাত্মক অভিনয় রীতিও অনুসৃত হয়েছে। 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্ব'-এর প্রবক্তা নাট্যকার সেলিম আল দীনের মতে, বাঙালির শিল্পরস পিপাসায় সহস্র বছর ধরে অদ্বৈত রুচিই প্রবল।[১১] পাশ্চাত্যের মতো এদেশে নাটক বিশুদ্ধ সংলাপ ও চরিত্রাভিনয়রীতেতে আবদ্ধ থাকেনি, সংগীত-নৃত্য-কাব্য বা উপাখ্যানকে আত্মস্থ করে দেহ-মনে 'অদ্বৈতের' ঝংকার ফুটিয়ে তুলেছে। তাই শেষবিচারে বলা যায়, আলোচ্য অঞ্চলে কৃষ্ণযাত্রায় বিবর্তনের সূত্র ধরে সংলাপ প্রবেশ করলেও নাট্য উপস্থাপনা চরিত্রভিত্তিক নিরালম্ব গদ্য সংলাপাত্মক অভিনয়রীতি অনুসরণ করেনি, বর্ণনাত্মক ও সংলাপাত্মক পরিবেশন রীতির সংমিশ্রণে এক 'অদ্বৈত শিল্পরীতি'কে অনুসরণ করেছে।

তথ্যসূত্র:

১. দীন, সেলিম আল। মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য। হাওলাদার প্রকাশনী, ২০১৮, ঢাকা, পৃ. ৩৪৯।

২. বসু, নগেন্দ্রনাথ। যাত্রা: উৎস ও ক্রমবিকাশ। বাংলার লোকসংস্কৃতি যাত্রাশিল্প, সৈকত আসগর সম্পা., বাংলা একাডেমী, ২০০২, ঢাকা, পৃ. ৩৭।

৩. বেরা, শ্যামল। কৃষ্ণযাত্রা। পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০১৩, কলকাতা, পৃ. ২৫।

৪. ঘোষাল, ছন্দা। লোকসংগীত। জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ মেদিনীপুর, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০০২, কলকাতা, পৃ. ১৪৭।

৫. বেরা, শ্যামল। কৃষ্ণযাত্রা। তদেব, পৃ. ২০।

৬. ড. গিরি, সত্য। বৈষ্ণব পদাবলী। চতুর্থ পরিবর্ধিত সংস্কর। রত্নাবলী, ২০১৩, কলকাতা, পৃ. ৩৬৬।

৭. বসু, নগেন্দ্রনাথ। তদেব, পৃ. ৪২।

৮. ড. গিরি, সত্য। তদেব, পৃ. ৩৬৬।

৯. ড. কুনডু, মণীন্দ্রলাল। সাহিত্যলোক। ২০০০, কলকাতা, পৃ. ১৬৫।

১০. চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব। যাত্রা ও যাত্রার ইতিবৃত্ত। বাংলার লোকসংস্কৃতি যাত্রাশিল্প। তদেব, পৃ. ২১।

১১. দীন, সেলিম আল। তদেব, পৃ. ৮৯।